ফ্রিৎস

জয়ন্তর দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে তাকে প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

'তোকে আজ যেন কেমন মনমরা মনে হচ্ছে? শরীর-টরীর খারাপ নয় তো?'

জয়ন্ত তার অন্যমনস্ক ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে একটা ছেলেমানুষি হাসি হেসে বলল, 'নাঃ! শরীর তো খারাপ নয়ই, বরং অলরেডি অনেকটা তাজা লাগছে। জায়গাটা সত্যিই ভাল।'

'তোর তো চেনা জায়গা। আগে জানতিস না ভাল?'

'প্রায় ভুলে গেসলাম।' জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'অ্যাদ্দিন বাদে আবার ক্রমে ক্রমে মনে পড়ছে। বাংলোটা তো মনে হয় ঠিক আগের মতোই আছে। ঘরগুলোরও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ফার্নিচারও কিছু কিছু সেই পুরনো আমলেরই রয়েছে বলে মনে হয়। যেমন এই বেতের টেবিল আর চেয়ারগুলো।'

বেয়ারা ট্রেতে করে চা আর বিস্কুট দিয়ে গেল। সবে চারটে বাজে, কিন্তু এর মধ্যেই রোদ পড়ে এসেছে। টি-পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কদ্দিন বাদে এলি?'

জয়ন্ত বলল, 'একত্রিশ বছর। তখন আমার বয়স ছিল ছয়।'

আমরা যেখানে বসে আছি সেটা বুন্দি শহরের সার্কিট হাউসের বাগান। আজ সকালেই এসে পৌঁছেছি। জয়ন্ত আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা এক স্কুলে ও এক কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। এখন ও একটা খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি করে, আর আমি করি ইস্কুল মাস্টারি। চাকরি জীবনে দু'জনের মধ্যে ব্যবধান এসে গেলেও বন্ধুত্ব টিকে আছে ঠিকই। রাজস্থান ভ্রমণের প্ল্যান আমাদের অনেকদিনের। দু'জনের একসঙ্গে ছুটি পেতে অসুবিধা হচ্ছিল, অ্যাদ্দিনে সেটা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ লোকেরা রাজস্থান গেলে আগে জয়পুর-উদয়পুর-চিতোরটাই দেখে—কিন্তু জয়ন্ত প্রথম থেকেই বুন্দির উপর জোর দিচ্ছিল। আমিও আপত্তি করিনি, কারণ ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'বুঁদির কেল্লা' নামটার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল, সে কেল্লা এতদিনে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হবে সেটা ভাবতে মন্দ লাগছিল না। বুন্দি অনেকেই আসে না; তবে তার মানে এই নয় যে এখানে দেখার তেমন কিছুই নেই। ঐতিহাসিক ঘটনার দিক দিয়ে বিচার করলে উদয়পুর, যোধপুর, চিতোরের মূল্য হয়তো অনেক বেশি, কিন্তু সৌন্দর্যের বিচারে বুন্দি কিছু কম যায় না।

জয়ন্ত বুন্দি সম্পর্কে এত জোর দিয়ে বলতে প্রথমে একটু অদ্ভুত লেগেছিল; ট্রেনে আসতে আসতে কারণটা জানতে পারলাম। সে ছেলেবেলায় একবার নাকি বুন্দিতে এসেছিল, তাই সেই পুরনো স্মৃতির সঙ্গে নতুন করে জায়গাটাকে মিলিয়ে দেখার একটা ইচ্ছে তার মনে অনেকদিন থেকেই ঘোরাফেরা করছে। জয়ন্তর বাবা অনিমেষ দাশগুপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগে কাজ করতেন, তাই তাঁকে মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়াতে হত। এই সুযোগেই জয়ন্তর বুন্দি দেখা হয়ে যায়।

সার্কিট হাউসটা সত্যিই চমৎকার। ব্রিটিশ আমলের তৈরি, বয়স অন্তত শ'খানেক বছর তো বটেই। একতলা বাড়ি, টালি বসানো ঢালু ছাত, ঘরগুলো উঁচু উঁচু, উপর দিকে স্কাইলাইট দড়ি দিয়ে টেনে ইচ্ছেমতো খোলা বা বন্ধ করা যায়। পুব দিকে বারান্দা। তার সামনে প্রকাণ্ড কম্পাউন্ডে কেয়ারি করা বাগানে গোলাপ ফুটে রয়েছে। বাগানের পিছন দিকটায় নানারকম বড় বড় গাছে অজস্র পাখির জটলা। টিয়ার তো ছড়াছড়ি। ময়ূরের ডাকও মাঝে মাঝে শোনা যায়, তবে সেটা কম্পাউন্ডের বাইরে থেকে।

আমরা সকালে পৌঁছেই আগেই একবার শহরটা ঘুরে দেখে এসেছি। পাহাড়ের গায়ে বসানো বুন্দির বিখ্যাত কেল্লা। আজ দূর থেকে দেখেছি, কাল একেবারে ভিতরে গিয়ে দেখব। শহরে ইলেকট্রিক

পোস্টগুলো না থাকলে মনে হত যেন আমরা সেই প্রাচীন রাজপুত আমলে চলে এসেছি। পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা, বাড়ির সামনের দিকে দোতলা থেকে ঝুলে পড়া অদ্ভুত সব কারুকার্য করা বারান্দা, কাঠের দরজাগুলোতে নিপুণ হাতের নকশা—দেখে মনেই হয় না যে আমরা যান্ত্রিক যুগে বাস করছি।

এখানে এসে অবধি লক্ষ করেছি জয়ন্ত সচরাচর যা বলে তার চেয়ে একটু কম কথা বলছে। হয়তো অনেক পুরনো স্মৃতি তার মনে ফিরে আসছে। ছেলেবেলার কোনও জায়গায় অনেকদিন পরে ফিরে এলে মনটা উদাস হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। আর জয়ন্ত যে সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বেশি ভাবুক সেটা তো সকলেই জানে।

চায়ের পেয়ালা হাত থেকে নামিয়ে রেখে জয়ন্ত বলল, 'জানিস শঙ্কর, ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত।

প্রথমবার যখন এখানে আসি, তখন মনে আছে এই চেয়ারগুলিতে আমি পা তুলে বাবু হয়ে বসতাম। মনে হত যেন একটা সিংহাসনে বসে আছি। এখন দেখছি চেয়ারগুলো আয়তনেও বড় না, দেখতেও অতি সাধারণ। সামনের যে ড্রয়িংরুম, সেটা এর দ্বিগুণ বড় বলে মনে হত। যদি এখানে ফিরে না আসতুম, তা হলে ছেলেবেলার ধারণাটাই কিন্তু টিকে যেত।'

আমি বললাম, 'এটাই তো স্বাভাবিক। ছেলেবেলায় আমরা থাকি ছোট; সেই অনুপাতে আশেপাশের জিনিসগুলোকে বড় মনে হয়। আমরা বয়সের সঙ্গে বাড়ি, কিন্তু জিনিসগুলো তো বাড়ে না!'

চা খাওয়া শেষ করে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে জয়ন্ত হঠাৎ হাঁটা থামিয়ে বলে উঠল—'দেবদারু।'

কথাটা শুনে আমি একটু অবাক হয়ে তার দিকে চাইলাম। জয়ন্ত আবার বলল, 'একটা দেবদারু গাছ—ওই ওদিকটায় থাকার কথা।'

এই বলে সে দ্রুতবেগে গাছপালার মধ্যে দিয়ে কম্পাউন্ডের কোণের দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ একটা দেবদারু গাছের কথা জয়ন্ত মনে রাখল কেন?

কয়েক সেকেন্ড পরেই জয়ন্তর উল্লসিত কণ্ঠস্বর পেলাম—'আছে! ইটস হিয়ার! ঠিক যেখানে ছিল সেখানেই—'

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'গাছ যদি থেকে থাকে তো, সে যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। গাছ তো আর হেঁটেচলে বেড়ায় না!'

জয়ন্ত একটু বিরক্তভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'সেখানেই আছে মানে এই নয় যে আমি ভেবেছিলাম এই ত্রিশ বছরে গাছটা জায়গা পরিবর্তন করেছে। সেখানে মানে আমি যেখানে গাছটা ছিল বলে অনুমান করেছিলাম, সেইখানে।'

'কিন্তু একটা গাছের কথা হঠাৎ মনে পড়ল কেন তোর?'

জয়ন্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে গাছের গুঁড়ির দিকে চেয়ে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা এখন আর কিছুতেই মনে পড়ছে না। কী একটা কারণে জানি গাছটার কাছে এসেছিলাম—কী একটা করেছিলাম। একটা সাহেব...'

'সাহেব?'

'না, আর কিছু মনে পড়ছে না। মেমারির ব্যাপারটা সত্যিই ভারী অদ্ভুত...'

এখানে বাবুর্চির রান্নার হাত ভাল। রাত্রে ডাইনিংরুমে ওভাল-শেপের টেবিলটায় বসে খেতে খেতে জয়ন্ত বলল, 'তখন যে বাবুর্চিটা ছিল, তার নাম ছিল দিল্‌ওয়ার! তার বাঁ গালে একটা কাটা দাগ ছিল, ছুরির দাগ—আর চোখ দুটো সবসময় জবাফুলের মতো লাল হয়ে থাকত। কিন্তু রান্না করত খাসা।'

খাবার পরে ড্রয়িংরুমের সোফাতে বসে জয়ন্তর ক্রমে আরও পুরনো কথা মনে পড়তে লাগল। তার বাবা কোন সোফায় বসে চুরুট খেতেন, মা কোথায় বসে উল বুনতেন, টেবিলের ওপর কী কী ম্যাগাজিন পড়ে থাকত—সবই তার মনে পড়ল।

আর এইভাবেই শেষে তার পুতুলের কথাটাও মনে পড়ে গেল।

পুতুল বলতে মেয়েদের ডল পুতুল নয়। জয়ন্তর এক মামা সুইজারল্যান্ড থেকে এনে দিয়েছিলেন দশ-বারো ইঞ্চি লম্বা সুইসদেশীয় পোশাক পরা একটা বুড়োর মূর্তি। দেখতে নাকি একেবারে একটি খুদে জ্যান্ত মানুষ। ভিতরে যন্ত্রপাতি কিছু নেই, কিন্তু হাত পা আঙুল কোমর এমনভাবে তৈরি যে ইচ্ছামতো বাঁকানো যায়। মুখে একটা হাসি লেগেই আছে। মাথার উপর ছোট্ট হলদে পালক গোঁজা সুইস পাহাড়ি টুপি। এ ছাড়া পোশাকের খুঁটিনাটিতেও নাকি কোনওরকম ভুল নেই—বেল্ট বোতাম পকেট কলার মোজা—এমনকী জুতোর বকলসটা পর্যন্ত নিখুঁত।

প্রথমবার বুন্দিতে আসার কয়েকমাস আগেই জয়ন্তর মামা বিলেত থেকে ফেরেন, আর এসেই জয়ন্তকে পুতুলটা দেন। সুইজারল্যান্ডের কোনও গ্রামে এক বুড়োর কাছ থেকে পুতুলটা কেনেন তিনি। বুড়ো নাকি ঠাট্টা করে বলে দিয়েছিল, 'এর নাম ফ্রিৎস। এই নামে ডাকবে একে। অন্য নামে ডাকলে কিন্তু জবাব পাবে না।'

জয়ন্ত বলল, 'আমি ছেলেবেলায় খেলনা অনেক পেয়েছি। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে ছিলাম বলেই বোধহয় তাঁরা এই ব্যাপারে আমাকে কখনও বঞ্চিত করেননি। কিন্তু মামার দেওয়া এই ফ্রিৎস-কে পেয়ে কী যে হল—আমি আমার অন্য সমস্ত খেলনার কথা একেবারে ভুলে গেলাম। রাতদিন ওকে নিয়েই পড়ে থাকতাম; এমনকী শেষে একটা সময় এল যখন আমি ফ্রিৎস-এর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিব্যি আলাপ চালিয়ে যেতাম। এক তরফা আলাপ অবিশ্যি, কিন্তু ফ্রিৎস-এর মুখে এমন একটা হাসি, আর ওর চোখে এমন একটা চাহনি ছিল যে, মনে হত যেন আমার কথা ও বেশ বুঝতে পারছে। এক-এক সময় এমনও মনে হত যে, আমি যদি বাংলা না বলে জার্মান বলতে পারতাম, তা হলে আমাদের আলাপটা হয়তো একতরফা না হয়ে দু'তরফা হত। এখন ভাবলে ছেলেমানুষি পাগলামি মনে হয়, কিন্তু তখন আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল ভীষণ 'রিয়েল'। বাবা-মা বারণ করতেন অনেক, কিন্তু আমি কারুর কথা শুনতাম না। তখন আমি ইস্কুল যেতে শুরু করিনি, কাজেই ফ্রিৎসকে দেবার জন্য সময়ের অভাব ছিল না আমার।'

এই পর্যন্ত বলে জয়ন্ত চুপ করল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাত সাড়ে ন'টা। বুন্দি শহর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আমরা সার্কিট হাউসের বৈঠকখানায় একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসে আছি।

আমি বললাম, 'পুতুলটা কোথায় গেল?'

জয়ন্ত এখনও যেন কী ভাবছে। উত্তরটা এত দেরিতে এল যে, আমার মনে হচ্ছিল প্রশ্নটা বুঝি ওর কানেই যায়নি।

'পুতুলটা বুন্দিতে নিয়ে এসেছিলাম। এখানে নষ্ট হয়ে যায়।'

'নষ্ট হয়ে যায়?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'কীভাবে?'

জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'একদিন বাইরে বাগানে বসে চা খাচ্ছিলাম আমরা। পুতুলটাকে পাশে ঘাসের ওপর রেখেছিলাম। কাছে কতগুলো কুকুর জটলা করছিল। তখন আমার যা বয়স, তাতে চা খাবার কথা নয়, কিন্তু জেদ করে চা নিয়ে খেতে খেতে হঠাৎ পেয়ালাটা কাত হয়ে খানিকটা গরম চা আমার প্যান্টে পড়ে যায়। বাংলোয় এসে প্যান্ট বদল করে বাইরে ফিরে গিয়ে দেখি পুতুলটা নেই। খোঁজাখুঁজির পর দেখি আমার ফ্রিৎসকে নিয়ে দুটো রাস্তার কুকুর দিব্যি টাগ-অফ-ওয়ার খেলছে। জিনিসটা খুবই মজবুত ছিল তাই ছিঁড়ে আলগা হয়ে যায়নি। তবে চোখমুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে জামাকাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ, আমার কাছে ফ্রিৎস-এর আর অস্তিত্বই ছিল না। হি ওয়াজ ডেড।'

'তারপর?' ভারী আশ্চর্য লাগছিল জয়ন্তর এই কাহিনী।

'তারপর আর কী? যথাবিধি ফ্রিৎস-এর সৎকার করি!'

'তার মানে?'

'ওই দেবদারু গাছটার নীচে ওকে কবর দিই। ইচ্ছে ছিল কফিন জাতীয় একটা কিছু জোগাড় করা—সাহেব তো! একটা বাক্স থাকলেও কাজ চলত, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিছুই পেলাম না। তাই শেষটায় এমনিই পুঁতে ফেলি।'

এতক্ষণে দেবদারু গাছের রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হল।

দশটা নাগাদ ঘুমোতে চলে গেলাম।

একটা বেশ বড় বেডরুমে দুটো আলাদা খাটে আমাদের বিছানা। কলকাতায় হাঁটার অভ্যেস নেই, এমনিতেই বেশ ক্লান্ত লাগছিল, তার উপর বিছানায় ডানলোপিলো। বালিশে মাথা দেবার দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুম এসে গেল।

রাত তখন ক'টা জানি না, একটা কীসের শব্দে জানি ঘুমটা ভেঙে গেল। পাশ ফিরে দেখি জয়ন্ত সোজা হয়ে বিছানার উপর বসে আছে। তার পাশের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে, আর সেই আলোয় তার চাহনিতে উদ্বেগের ভাবটা স্পষ্ট ধরা পড়ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে আমাকে একটা পালটা প্রশ্ন করল—'সার্কিট হাউসে বেড়াল বা ইঁদুর জাতীয় কিছু আছে নাকি?'

বললাম, 'থাকাটা কিছুই আশ্চর্য না। কিন্তু কেন বল তো?'

'বুকের উপর দিয়ে কী যেন একটা হেঁটে গেল। তাই ঘুমটা ভেঙে গেল।'

আমি বললাম, 'ইঁদুর জিনিসটা সচরাচর নর্দমা-টর্দমা দিয়ে ঢোকে। আর খাটের উপর ইঁদুর ওঠে বলে তো জানা ছিল না।'

জয়ন্ত বলল, 'এর আগেও একবার ঘুমটা ভেঙেছিল, তখন জানলার দিক থেকে একটা খচখচ শব্দ পাচ্ছিলাম।'

'জানলায় যদি আওয়াজ পেয়ে থাকিস তা হলে বেড়ালের সম্ভাবনাটাই বেশি।'

'কিন্তু তা হলে...'

জয়ন্তর মন থেকে যেন খটকা যাচ্ছে না। বললাম, 'বাতিটা জ্বালার পর কিছু দেখতে পাসনি?'

'নাথিং। অবিশ্যি ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গেই বাতিটা জ্বালিনি। প্রথমটা বেশ হকচকিয়ে গেসলাম। সত্যি বলতে কি, একটু ভয়ই করছিল। আলো জ্বালার পর কিছুই দেখতে পাইনি।'

'তার মানে যদি কিছু এসে থাকে তা হলে সেটা ঘরের মধ্যেই আছে?'

'তা...দরজা যখন দুটোই বন্ধ...'

আমি চট করে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের আনাচে কানাচে, খাটের তলায়, সুটকেসের পিছনে একবার খুঁজে দেখে নিলাম। কোথাও কিছু নেই। বাথরুমের দরজাটা ভেজানো ছিল; সেটার ভিতরেও খুঁজতে গেছি, এমন সময় জয়ন্ত চাপা গলায় ডাক দিল।

'শঙ্কর!'

ফিরে এলাম ঘরে। জয়ন্ত দেখি তার লেপের সাদা ওয়াড়টার দিকে চেয়ে আছে। আমি তার দিকে এগিয়ে যেতে সে লেপের একটা অংশ ল্যাম্পের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা কী দ্যাখ তো।'

কাপড়টার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখি তাতে হালকা খয়েরি রঙের ছোট ছোট গোল গোল কীসের জানি ছাপ পড়েছে। বললাম, 'বিড়ালের থাবা হলেও হতে পারে।'

জয়ন্ত কিছু বলল না। বেশ বুঝতে পারলাম কী কারণে জানি সে ভারী চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এদিকে রাত আড়াইটে বাজে। এত কম ঘুমে আমার ক্লান্তি দূর হবে না, তা ছাড়া কালকেও সারাদিন ঘোরাঘুরি আছে। তাই, আমি পাশে আছি, কোনও ভয় নেই, ছাপগুলো আগে থেকেই থাকতে পারে, ইত্যাদি বলে কোনওরকমে তাকে আশ্বাস দিয়ে বাতি নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। আমার কোনও সন্দেহ ছিল না যে, জয়ন্ত যে অভিজ্ঞতার কথাটা বলল সেটা আসলে তার স্বপ্নের অন্তর্গত। বুন্দিতে এসে পুরনো কথা মনে পড়ে ও একটা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে, আর তার থেকেই বুকে বেড়াল হাঁটার স্বপ্নের উদ্ভব হয়েছে।

রাত্রে আর কোনও ঘটনা ঘটে থাকলেও আমি সে বিষয়ে কিছু জানতে পারিনি, আর জয়ন্তও সকালে উঠে নতুন কোনও অভিজ্ঞতার কথা বলেনি। তবে তাকে দেখে এটুকু বেশ বুঝতে পারলাম যে, রাত্রে তার ভাল ঘুম হয়নি। মনে মনে স্থির করলাম যে, আমার কাছে যে ঘুমের বড়িটা আছে, আজ রাত্রে শোয়ার আগে তার একটা জয়ন্তকে খাইয়ে দেব।

আমার প্ল্যান অনুযায়ী আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে ন'টার সময় বুন্দির কেল্লা দেখতে গেলাম। গাড়ির ব্যবস্থা করা ছিল আগে থেকেই। কেল্লায় পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ে গেল প্রায় সাড়ে ন'টা।

এখানে এসেও দেখি জয়ন্তর সব ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে তার পুতুলের কোনও সম্পর্ক নেই। সত্যি বলতে কি, জয়ন্তর ছেলেমানুষি উল্লাস দেখে মনে হচ্ছিল সে বোধহয় পুতুলের কথাটা ভুলে গেছে। একেকটা জিনিস দেখে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—'ওই যে গেটের মাথায় সেই হাতি! ওই যে সেই গম্বুজ! এই সেই রুপোর খাট আর সিংহাসন! ওই যে দেয়ালে আঁকা ছবি!...'

কিন্তু ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই তার ফুর্তি কমে এল। আমি নিজে এত তন্ময় ছিলাম যে, প্রথমে সেটা বুঝতে পারিনি। একটা লম্বা ঘরের ভিতর দিয়ে হাঁটছি আর সিলিং-এর দিকে চেয়ে ঝাড় লণ্ঠনগুলো দেখছি, এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হল জয়ন্ত আমার পাশে নেই। কোথায় পালাল সে?

আমাদের সঙ্গে একজন গাইড ছিল, সে বলল বাবু বাইরে ছাতের দিকটায় গেছে।

দরবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখি জয়ন্ত বেশ খানিকটা দূরে ছাতের উলটো দিকের পাঁচিলের পাশে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে আপন চিন্তায় এমনই মগ্ন যে, আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেও তার অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না। শেষটায় আমি নাম ধরে ডাকতে সে চমকে উঠল। বললাম, 'কী হয়েছে তোর ঠিক করে বল তো। এমন চমৎকার জায়গায় এসেও তুই মুখ ব্যাজার করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবি—এ আমার বরদাস্ত হচ্ছে না।'

জয়ন্ত শুধু বলল, 'তোর দেখা শেষ হয়েছে কি? তা হলে এবার...'

আমি একা হলে নিশ্চয়ই আরও কিছুক্ষণ থাকতাম, কিন্তু জয়ন্তর ভাবগতিক দেখে সার্কিট হাউসে ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম।

পাহাড়ের গা দিয়ে বাঁধানো রাস্তা শহরের দিকে গিয়েছে। আমরা দু'জনে চুপচাপ গাড়ির পিছনে বসে আছি। জয়ন্তকে সিগারেট অফার করতে সে নিল না। তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ করলাম, যেটা প্রকাশ পাচ্ছিল তার হাত দুটোর অস্থিরতায়। হাত একবার গাড়ির জানলায় রাখছে, একবার কোলের ওপর, পরক্ষণেই আবার আঙুল মটকাচ্ছে, না হয় নখ কামড়াচ্ছে। জয়ন্ত এমনিতে শান্ত মানুষ। তাকে এভাবে ছটফট করতে দেখে আমার ভারী অসোয়াস্তি লাগছিল।

মিনিট দশেক এইভাবে চলার পর আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, 'তোর দুশ্চিন্তার কারণটা আমায় বললে হয়তো তোর কিছুটা উপকার হতে পারে।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, 'বলে লাভ নেই, কারণ বললে তুই বিশ্বাস করবি না।'

'বিশ্বাস না করলেও, বিষয়টা নিয়ে অন্তত তোর সঙ্গে আলোচনা করতে পারব।'

'কাল রাত্রে ফ্রিৎস আমাদের ঘরে এসেছিল। লেপের ওপর ছাপগুলো সব ফ্রিৎসের পায়ের ছাপ।'

এ-কথার পর অবিশ্যি জয়ন্তর কাঁধ ধরে দুটো ঝাঁকুনি দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করার থাকে না। যার মাথায় এমন একটা প্রচণ্ড আজগুবি ধারণা আশ্রয় নিয়েছে, তাকে কি কিছু বলে বোঝানো যায়? তবু বললাম, 'তুই নিজের চোখে তো দেখিসনি কিছুই।'

'না—তবে বুকের উপর যে জিনিসটা হাঁটছে সেটা যে চারপেয়ে নয়, দু' পেয়ে, সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম।'

সার্কিট হাউসে এসে গাড়ি থেকে নামার সময় মনে মনে স্থির করলাম জয়ন্তকে একটা নার্ভ টনিক গোছের কিছু দিতে হবে। শুধু ঘুমের বড়িতে হবে না। ছেলেবেলার সামান্য একটা স্মৃতি একটা সাঁইত্রিশ বছরের জোয়ান মানুষকে এত উদ্ব্যস্ত করে তুলবে—এ কিছুতেই হতে দেওয়া চলে না।

ঘরে এসে জয়ন্তকে বললাম, 'বারোটা বাজে, স্নানটা সেরে ফেললে হত না!'

জয়ন্ত 'তুই আগে যা' বলে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

স্নান করতে করতে আমার মাথায় ফন্দি এল। জয়ন্তকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার বোধহয় এই একমাত্র রাস্তা।

ফন্দিটা এই—ত্রিশ বছর আগে যদি পুতুলটাকে একটা বিশেষ জায়গায় মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়ে থাকে, আর সেই জায়গাটা কোথায় যদি জানা থাকে, তা হলে সেখানে মাটি খুঁড়লে আস্ত পুতুলটাকে আগের অবস্থায় না পেলেও, তার কিছু অংশ এখনও নিশ্চয়ই পাবার সম্ভাবনা আছে। কাপড় জামা মাটির তলায় ত্রিশ বছর থেকে যেতে পারে না; কিন্তু ধাতব জিনিস—যেমন ফ্রিৎসের বেল্টের বকলস বা কোটের পেতলের বোতাম—এসব জিনিসগুলো টিকে থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়। জয়ন্তকে যদি দেখানো যায় যে তার সাধের পুতুলের শুধু ওই জিনিসগুলোই অবশিষ্ট আছে, আর সব মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তা হলে হয়তো তার মন থেকে উদ্ভট ধারণা দূর হবে। এ না করলে প্রতিরাত্রেই সে আজগুবি স্বপ্ন দেখবে, আর সকালে উঠে বলবে ফ্রিৎস আমার বুকের উপর হাঁটাহাঁটি করছিল। এইভাবে ক্রমে তার মাথাটা বিগড়ে যাওয়া অসম্ভব না।

জয়ন্তকে ব্যাপারটা বলাতে তার ভাব দেখে মনে হল ফন্দিটা তার মনে ধরেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সে বলল, 'খুঁড়বে কে? কোদাল কোথায় পাবে?'

আমি হেসে বললাম, 'এতবড় বাগান যখন রয়েছে তখন মালিও একটা নিশ্চয়ই আছে। আর মালি থাকা মানেই কোদালও আছে। লোকটাকে কিছু বকশিশ দিলে সে মাঠের এক প্রান্তে একটা গাছের

গুঁড়ির পাশে খানিকটা মাটি খুঁড়ে দেবে না—এটা বিশ্বাস করা কঠিন।'

জয়ন্ত তৎক্ষণাৎ রাজি হল না। আমিও আর কিছু বললাম না। আরও দু-একবার হুমকি দেবার পর সে শান্তটা সেরে এল। এমনিতে খাইয়ে লোক হলেও, দুপুরে সে মাত্র দু'খানা হাতের রুটি আর সামান্য মাংসের কারি ছাড়া আর কিছুই খেল না। খাওয়া সেরে বাগানের দিকের বারান্দায় গিয়ে বেতের চেয়ারে বসে রইলাম দু'জনে। আমরা ছাড়া সার্কিট হাউসে কেউ নেই। দুপুরটা থমথমে। ডানদিকে নুড়ি ফেলা রাস্তার ওপাশে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছে কয়েকটা হনুমান বসে আছে, মাঝে মাঝে তাদের হুপ্ হুপ্ ডাক শোনা যাচ্ছে।

তিনটে নাগাদ একটা পাগড়ি পরা লোক হাতে একটা ঝারি নিয়ে বাগানে এল। লোকটার বয়স হয়েছে। চুল গোঁফ গালপাট্টা সবই ধবধবে সাদা।

'তুমি বলবে, না আমি?'

জয়ন্তর প্রশ্নতে আমি তার দিকে আশ্বাসের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে ইশারা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা চলে গেলাম মালিটার দিকে।

মাটি খোঁড়ার প্রস্তাবে মালি প্রথমে কেমন জানি অবাক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। বোঝা গেল এমন প্রস্তাব তাকে এর আগে কেউ কোনওদিন করেনি। তার 'কাহে বাবু?' প্রশ্নতে আমি তার কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বললাম, 'কারণটা না হয় নাই জানলে। পাঁচ টাকা বকশিশ দেব—যা বলছি করে দাও।'

বলা বাহুল্য, মালি তাতে শুধু রাজিই হল না, দন্ত বিকশিত করে সেলাম টেলাম ঠুকে এমন ভাব দেখাল যেন সে আমাদের চিরকালের কেনা গোলাম।

বারান্দায় বসা জয়ন্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকলাম। সে চেয়ার ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। কাছে এলে বুঝলাম তার মুখ অস্বাভাবিক রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আশা করি খোঁড়ার ফলে পুতুলের কিছুটা অংশ অন্তত পাওয়া যাবে।

মালি ইতিমধ্যে কোদাল নিয়ে এসেছে। আমরা তিনজনে দেবদারু গাছটার দিকে এগোলাম।

গাছের গুঁড়িটার থেকে হাত দেড়েক দূরে একটা জায়গার দিকে হাত দেখিয়ে জয়ন্ত বলল, 'এইখানে।'

'ঠিক মনে আছে তো তোর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

জয়ন্ত মুখে কিছু না বলে কেবল মাথাটা একবার নাড়িয়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল।

'কতটা নীচে পুঁতেছিলি?'

'এক বিঘত তো হবেই।'

মালি আর দ্বিরুক্তি না করে মাটিতে কোপ দিতে শুরু করল। লোকটার রসবোধ আছে। খুঁড়তে খুঁড়তে একবার জিজ্ঞেস করল মাটির নীচে ধনদৌলত আছে কিনা, এবং যদি থাকে তা হলে তার থেকে তাকে ভাগ দেওয়া হবে কিনা। এ-কথা শুনে আমি হাসলেও, জয়ন্তর মুখে কোনও হাসির আভাস দেখা গেল না। অক্টোবর মাসে বুন্দিতে গরম নেই, কিন্তু কলারের নীচে জয়ন্তর শার্ট ভিজে গেছে। সে একদৃষ্টে মাটির দিকে চেয়ে রয়েছে। মালি কোদালের কোপ মেরে চলেছে। এখনও পুতুলের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না কেন?

একটা ময়ূরের তীক্ষ্ণ ডাক শুনে আমি মাথাটা একবার ঘুরিয়েছি, এমন সময় জয়ন্তর গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ পেয়ে আমার চোখটা তৎক্ষণাৎ তার দিকে চলে গেল। তার নিজের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। পরক্ষণেই তার কম্পমান ডান হাতটা সে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দিয়ে তর্জনীটাকে সোজা করে গর্তটার দিকে নির্দেশ করল। আঙুলটাকেও স্থির রাখতে পারছে না সে।

তারপর এক অস্বাভাবিক শুকনো ভয়ার্ত স্বরে প্রশ্ন এল—

'ওটা কী!'

মালির হাত থেকে কোদালটা মাটিতে পড়ে গেল।

মাটির দিকে চেয়ে যা দেখলাম তাতে ভয়ে, বিস্ময়ে ও অবিশ্বাসে আপনা থেকেই আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

দেখলাম, গর্তের মধ্যে ধুলোমাখা অবস্থায় চিত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একটি দশ-বারো ইঞ্চি ধবধবে সাদা নিখুঁত নরকঙ্কাল!